জান্তব

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

জালের বাইরে থেকে অদ্ভুত জীবটিকে দেখেই আমি শিউরে উঠলাম, তারপর আস্তে-আস্তে স্থির হয়ে গেলাম। একেবারে স্থির।

জানি না এভাবে কতক্ষণ পাথর হয়ে ছিলাম; সংবিৎ ফিরল যখন আমার তরুণী গাইড মারিয়ান আমার কনুইয়ে সামান্য নাড়া দিয়ে বলল, স্যার, চলুন। এবার অন্য কিছু দেখবেন তো? একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি টান টান সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। বাঁ-হাতে ধরা লণ্ডন গাইডবুকটা ডান হাতে চালান করলাম, অনাবশ্যকভাবেই আঙুল চালালাম চুলে। কিছু একটা বলব বলে তৈরি হয়েও হঠাৎ চুপ মেরে গেলাম। কথার বদলে মুখে মুঠো চাপা দিয়ে কাশলাম। মারিয়ান আমার মনের অবস্থার মাথামুন্ডু না বুঝে ফের বলল, স্যার, আপনি কি অন্য কোনো পশুপাখি দেখবেন না?

আমার তখনও মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছে না। আমি মারিয়ানের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ফের খাঁচার জীবটাকেই দেখছি। দেশ-দুনিয়া থেকে ভিড় করে ইদানীং যাকে দেখে যাচ্ছে মানুষজন। কাগজে-কাগজে ফলাও করে যাকে

নিয়ে লেখা হচ্ছে আধুনিক যুগের এক সেরা আবিষ্কার। বর্ণনা করা হচ্ছে কখনো গুহামানব বলে, কখনো বনমানুষ বলে, কখনো গোরিলামানব বলে, কখনো স্রেফ আদিমানব বলে। স্কটল্যাণ্ডের এক হ্রদসন্নিবর্তী পাহাড়ের গুহা থেকে একে আবিষ্কারের পর থেকেই বিশ্ব জুড়ে বিতর্ক চালু হয়েছে এই মানুষ বা জন্তু এতদিন এভাবে এক সভ্য এলাকায় টিকে থাকল কী করে। এর জনক-জননী কে, এর বয়স কত, এর জ্ঞাতিগুষ্টি কারা, এ এল কোত্থেকে কিংবা এই গুহাতেই এতকাল ধরে মানুষের অগোচরে রইল কী করে—এই সব নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জন্তুটি নিয়ে চাঞ্চল্য এতদূর ছড়িয়েছে যে লণ্ডনের ট্যুরিস্ট ম্যাপে এখন বড়ো-বড়ো করে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে মোরফিল্ড জু-এর টিউব স্টেশনের নাম। আর দিনে হাজার হাজার দর্শক ভিড় করে এসে বিস্ফারিত নেত্রে দেখেছে আধুনিক যুগের এই সেরা আবিষ্কারকে।

আমি লণ্ডন এসেছি ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক বৃত্তি নিয়ে ছ-সপ্তাহের জন্য কাজ হল ইংল্যাণ্ডের ইশকুলে ইশকুলে পড়ানোর ধরনধারণ ঘুরে ঘুরে দেখা। এভাবে পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে এবং আমিও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; এবার বাকি সপ্তাহটায় লণ্ডন শহরটা ভালো করে চষে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে। আমি লণ্ডন দেখতে চাই শুনে এখানকার এক পাবলিক স্কুল ল্যাটিমোর-এর ইতিহাসের টিচার মারিয়ান হোয়াইট বলে বসল, চলুন, আগামী শনিবার আপনাকে মোরফিল্ড চিড়িয়াখানা নিয়ে যাই।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, হঠাৎ চিড়িয়াখানা কেন? আমি কি এখনও বাচ্চা আছি নাকি? শুনে ও আরও বেশি অবাক হয়ে বলেছিল, সে কী! সারাপৃথিবীর লোক এখনও বেঁকে আসছে মোরফিল্ডে আর আপনি লণ্ডনে বসেও সেখানে যাবেন না? আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল মোরফিল্ডের ওই আজব জীবের সম্পর্কে লেখালেখিগুলো। বটেই তো! এরকম আজব একটা জন্তু দেখার সুযোগ আর কবেই বা পাব। তবু নিজের বোকা প্রশ্নটা সামলে

দেওয়ার জন্য বললাম, আচ্ছা মারিয়ান, তোমার কি মনে হয় একটা প্রকৃত গুহামানব হঠাৎ করে পর্বতের কন্দর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে? তাও আবার স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় থেকে।

মারিয়ান মুখ টিপে একটু হেসে বলেছিল, সে তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন। আপনি বিজ্ঞানের লোক। আগে থেকে জল্পনা-কল্পনা না করে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে এলেই ভালো হত না? আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, তথাস্তু!

কিন্তু জীবটিকে দেখে বিশ্বাস, সংশয় বা বিস্ময়ের চেয়ে ঢের বেশি যেটা হল সেটা ভয়। জীবটা সত্যিই গুহামানব কি না প্রশ্ন একবারও মনে উঁকি দিয়ে যায়নি, এর জাতি বা প্রজাতি কী তা নিয়ে মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি; শুধু একটাই কথা বারবার মনের মধ্যে ঘুরছে—একে আমি দেখেছি! আমার এপাশে-ওপাশে, পিছনে অগুনতি নারী-পুরুষ শিশু, কত কথা বলছে এই জন্তুটাকে নিয়ে, কিছু ছেলেপুলে দেখি ছোলা-মটর-পপকর্নও ছোড়াছুড়ি শুরু করেছে, ওকে খাওয়াবে বলে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে মারিয়ান নখ কামড়ানো শুরু করেছে আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে। কিন্তু আমার ভয় কাটছে না। শেষে অনেক চেষ্টা করে মুখ ফুটে শুধু বলতে পারলাম আমার গাইডকে, মারিয়ান, তুমি না হয় একটু কফি খেয়ে এসো ক্যাফেটেরিয়া থেকে। আমি আরেকটুক্ষণ এই জীবটাকে দেখি।

মারিয়ান চলে গেল, আর ফিরে এল আমার সেই স্মৃতির বনমানুষ যার গল্প শুনতাম ঠাকুরমার কাছে। আমি খাঁচার জন্তুটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম ঠাকুরমার গল্পের সেই জীবটিকে।

সবে পুজো শেষ হয়েছে, শীত পড়ব-পড়ব করছে, রাতের বেলায় আমরা ভাইবোনেরা গায়ে লেপ মুড়ে ঘুমের তোড়জোড় করছি, হঠাৎ দাদা বায়না ধরল, ঠাকুরমা, একটা ভূতের গল্প বলো। অমনি ভিতু ছোড়দিটা কেঁদে উঠল, না, না, ঠাকুমা ভূতের গল্প না। আমার ভয় করে। বড়দি বলল, না, ঠাকুরমা। তুমি একটা চোরপুলিশের গল্প বলো। ঠাকুরমা বাটা খুলে এক খিলি পান মুখে গুঁজে বলল, কেমন হয় বল তো যদি তেমন একটা কিছুকে নিয়ে বলি যা মানুষও নয় ভূতও নয় আবার জন্তুও নয়? আমি অবাক হয়ে বললাম, তা হলে তো সেটা কিছুই নয়। তার গল্পও তা হলে গল্পও নয়।

ঠাকুরমা হাসল। ওর সেই মিষ্টি-মিষ্টি ফোকলা হাসি। বলল, ঠিক ধরেছিস দীপু। এটা গল্পও নয়। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

আমরা সবাই তখন উৎকন্ঠার সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠলাম, কী বেরিয়েছে ঠাকুরমা? ঠাকুমরা পান চিবুতে-চিবুতে বলল, একটা বনমানুষের কথা। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। যারা দেখেছে তারা বলছে বনমানুষ। অথচ যা বর্ণনা দিচ্ছে তাতে সে গুহামানবও হতে পারে। গোরিলা হতে পারে। নরপিশাচও হতে পারে।

অ্যাদ্দুর শোনামাত্র চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল ছোড়দি। কিন্তু ঠাকুরমাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। গল্প বলা একবার শুরু হলে ঠাকুরমাকে থামানো দায়। ঠাকুরমা বলে চলল নরপিশাচ কী জানিস তো? আদ্ধেক মানুষ আর আদ্ধেক শয়তান। মানুষের মতোই, তবে গোরিলার মতো লম্বা-লম্বা লোম গায়ে। হাতে বড়ো-বড় নখ, ভাঁটার মতো চোখ আর খোঁচা-খোঁচা, ধারালো দাঁত। তার মধ্যে দু-দিকে দুটো দাঁত ঠোঁটের বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসে। গোরিলার চোখের পাতা যেমন পড়েই না, এরটা তার উলটো। সারাক্ষণ পতপত করে

চোখের পাতা পড়ে। তবে চোখে-মুখে ভয়-ভীতি বলে কোনো বস্তু নেই। সারাক্ষণ ডাইনে বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে যে দেখবে কোন দিক থেকে কী বিপদ এল, তার বালাই নেই। তা হলে বোঝ! একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী জীব সারাক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে বসে বাঁদরদের মতো চোখের পাতা ফেলে যাচ্ছে। একবার ওর সামনে পড়লে প্রাণ নিয়ে পালানো মুশকিল। জন্তুটা যে কী ভেবে কী করবে বোঝা দায়; তাই যারাই সামনে পড়েছে বেজির সামনে পড়া সাপের মতো স্থির হয়ে গেছে। বনমানুষ কাউকে থাবা মেরে চুরমার করে দিয়েছে, কাউকে আবার কিছুই বলেনি। যারা দূর থেকে ওকে দেখেছে তারা পালিয়ে বেঁচে ওর বর্ণনা দিতে গিয়েও শিউরে-শিউরে উঠেছে। এত ভয়ে ওরা কেউই ঠিক ভালো মতন দেখেনি, বা যা দেখেছে ভুলে মেরে দিয়েছে। তাই ওদের অনেকের বর্ণনার সঙ্গেই অনেকের বর্ণনা মেলে না। হঠাৎ তখন কী মনে করেই জানি আমি জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম, ঠাকুরমা, ক-জন দেখেছে ওকে?

ঠাকুরমা কথার মধ্যে থেমে গিয়ে বোধ হয় মনে-মনে গুনল। তারপর বলল, জনা পনেরো তো হবেই।

আমি কেন জানি না বলে ফেললাম, ইশ! আমিও যদি দেখতে পেতুম। তা হলে এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমার গল্পের সেই বনমানুষটাকেই কি চাক্ষুষ করছি আমি? আর অহেতুক এত ভয়ই বা পাচ্ছি কেন? আমি খাঁচাটার থেকে অনেকটা পিছিয়ে এসে বাচ্চাদের মাথার উপর থেকে জন্তুটাকে দেখতে লাগলাম। আর ওই অতখানি দূরত্ব থেকে দেখতে-দেখতে আমার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল। ঠাকুরমার গল্প শোনার দু-দিন বাদে সন্ধ্যেবেলা ছাদের আলসের উপর দাঁড়িয়ে দেখা।

ঠাকুরমার গল্প শোনার পর থেকেই সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই বনমানুষটার চেহারা। ধূসর বর্ণের লোমশ শরীর, ধারালো নখ আর

দাঁত। তার মধ্যে দুটো দাঁত মুখের বাইরে বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল যার চোখের পাতা ঘনঘন পড়ে যাচ্ছে। এই সবই ভাবছিলাম সারাক্ষণ, মনের চোখে এরকম একটা চেহারাই ভাসছিল সিনেমার ছবির মতো। আর বাইরে আকাশে গোধূলির আলো আস্তে আস্তে নিভে আসছিল। হঠাৎ দূর থেকে একটা জোরালো চিৎকার শুনলাম ডোকাট্টা। এটা পাড়ার মস্তান ভানুদার চিৎকার। নিশ্চয়ই কারও একটা ঘুড়ি কেটে দিল ভানুদা। এটা মনে হতেই আমি মনের সব আজগুবি চিন্তা তাড়িয়ে ছুট্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আলসের উপর। যে-দৃশ্য দেখলে মা বা কাকা আমার হাড়মাস পিটিয়ে এক করে দিত। কোনো পরিস্থিতিতেতেই আমার আলসেতে চড়া বারণ। অথচ 'ডোকাট্টা' ধ্বনিটা শুনলেই আমার মাথার ভিতরে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। নিশির ডাকের মতো ওই ডাক আমাকে আপনা থেকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় আলসের উপর। ঘুড়ি ধরব বলে।

আমি আলসের উপর দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম আকাশের শেষ, ক্ষীণ, কমলা আভায় একটা বড়োবড়ো মুখপোড়া ঘুরি হাওয়ায় দুলতে দুলতে ভেসে আসছে আমাদের ছাদের দিকে। আমি টানটান হয়ে তৈরি হলাম সেটা নাগালের মধ্যে এলেই মাঞ্জা ধরে টেনে নিতে। কিন্তু ও কী! আমাদের ছাদের মাত্র দেড় হাত দূর থেকে উলটো হাওয়ায় ঘুড়িটা ভেসে যাচ্ছে অন্যদিকে। আমি একপায়ে ভর করে আরেক পা হাওয়ায় রেখে বাইরের দিকে হেলে সুতোটা ধরতে যাচ্ছি...আমার শরীর হিম হয়ে গেল। দেখি আলসের ওই প্রান্তে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছে ঠাকুরমার গল্পের ওই নরপিশাচ!

আমি ঘুড়ির মায়া ছেড়ে বাবা গো!' বলে আর্তনাদ করে ছাদের ভিতরের দিকে লাফ দিলাম। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা পেলাম, মনে হল যেন পাথর মেরেছে পায়ে কেউ। কিন্তু সেই পায়েই লাফাতে লাফাতে নেমে এলাম ছাদের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে। নীচে পৌঁছুতে মা আমাকে দেখে ছুটে এসে ধরল—কী হয়েছে

দীপু! অমন হাঁপাচ্ছিস কেন? আমি ভয়ে, লজ্জায় হিম হয়ে গিয়ে চুপ মেরে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর কোনোক্রমে বলতে পারলাম, পায়ে ভীষণ লেগেছে, মা!

রাতেরবেলা মার পাশে শুয়ে-শুয়ে বহুক্ষণ সেই দৃশ্যটাই দেখলাম। আমি ঘুড়ি ধরতে যাচ্ছি, আর আমাকে একদৃষ্টে দেখে যাচ্ছে ওই নরপিশাচ। পরদিন সকালে ছাদে গিয়ে দেখলাম জায়গাটা। আর ফের একবার শিউরে উঠলাম। হে ভগবান, নরপিশাচ ওইখানে বসে দেখা না দিলে তো আমি নীচে পড়ে একেবারে থেঁতলে ছাতু হয়ে যেতাম!

সেই ভয়টাই এতদিন পর ফিরে এল মোরফিল্ডের চিড়িয়াখানায় এই বনমানুষটাকে দেখতে-দেখতে। অবিকল সেই নরপিশাচটাই যেন। তিরিশ বছর পরা ধরা পড়ে জালের মধ্যে এসে ঠেকেছে। ঠাকুরমার গল্পের সেই নরপিশাচ। আমার বালক বয়সের কল্পনারও। হঠাৎ একটা সিগারেট ধরানোর শখ হল। কিন্তু চিড়িয়াখানার মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। আমি হাঁটা লাগালাম ক্যাফেটেরিয়ার দিকে, মারিয়ানকে পাকড়াও করব বলে। ঢের হয়েছে চিড়িয়াখানা ঘোরা; এবার আমি বাড়ির দিকে যাব গাইডকে সঙ্গী করে।

ক্যাফেটেরিয়ার কাছাকাছি হতেই দেখি কফি খাওয়া সেরে মারিয়ানও বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে বলল, হাই মিস্টার বোস, আপনার বনমানুষ দেখার সাধ মিটল? আমি সলজ্জ ভঙ্গিতে বললাম, খুব। ও জিজ্ঞেস করল, আপনার বিশ্বাস হল? আমি বললাম, কী জানি, কোথায় কী চালাকি কেঁদেছে ঠিক ধরতে পারলাম না। আরও একবার আসব ভাবছি। তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, আপনাদের মতো বিজ্ঞানের

লোকদের নিয়েই যত ঝামেলা। যাদুচোখে দেখবেন তাতেও বিশ্বাস হওয়ার নয়। তা যাকগে, এখন আর কী দেখবেন বলুন?

এবার আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, না। আজ এই থাক। এখন বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করছে। সঙ্গে-সঙ্গে মারিয়ান বলল, তা হলে আমার বাড়িতেই চলুন না। গুহামানব, আদিমানব ইত্যাদি নিয়ে আমার বেশ কিছু বই আছে। গবেষণার তথ্যের পাশাপাশি অনেক কাল্পনিক ছবিও পাবেন তাতে। একটু পাতা ওলটাতে পারেন। আমিও সেই ফাঁকে আপনার জন্য একটু ডিনার বেঁধে ফেলব।

মাথায় যখন বনমানুষ ঘুরছে ঠিক তখনই সেই সংক্রান্ত বইয়ের খবর পেয়ে ফুর্তিতে

লাফিয়ে উঠলাম। আহ্লাদের সঙ্গে বলে বসলাম, এই হলে গাইড। আমি অবশ্যই তোমার ওখানে যাব।

ওর বসার ঘরে খান পাঁচেক মোটা-মোটা চিত্রবহুল বই ধরিয়ে দিয়ে মারিয়ান চলে গেল কিচেনে নৈশভোজ রাঁধতে। আর আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে একেকটা বই ধরে পাতা ওলটাতে লাগলাম। আদিমানব, বনমানুষ, নরপিশাচের কত-কত রকমের কাল্পনিক ছবি। কিন্তু কোনোটাই ঠিক আমার সেই কল্পনার কিং বা একটু আগে মোরফিল্ডের চিড়িয়াখানায় ওই জন্তুটার সঙ্গে মেলে না। তা হলে এই জন্তুটা বাস্তবে কী!

এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি আরও-আরও পাতা ওলটাতে লাগলাম আর যেখানে একটু কৌতূহল হল পড়তে লাগলাম। অথচ কৌতূহল মেটে না। শেষে ‘ধুত্তোর!’ বলে বইগুলো কার্পেটে ছুড়ে ফেলে চলে গেলাম রান্নাঘরের দিকে, মারিয়ানকে একটু কফি বানাতে বলব বলে। আর গিয়েই তাজ্জব! আমার

বলার অপেক্ষায় নেই মেয়েটি। ডিনার রান্না করে হটকেসে ভরে ও দু-কাপ কফিও বানিয়ে ফেলেছে। আমার দেখেই একগাল হেসে বলল, কফি চাই তো? আমি বিজ্ঞানীদের ব্যাপারটা কিছুটা বুঝি। আমি গদগদ হয়ে বললাম, তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে, মারিয়ান! এবার বলো তো তুমি আর কী বুঝলে আমার ব্যাপারে?

ও একটা ছোট্ট ট্রে-তে দু-কাপ কফি রেখে ট্রে-টা ধরে হাঁটতে লাগল বসার ঘরের দিকে। আমি ওর পিছন-পিছন হাঁটলাম আর শুনলাম ও বলছে, আর এও বুঝেছি যে বইগুলো ঘেঁটে আপনার এতটুকুও কৌতূহল মেটেনি।

আমি বেশ অবাক হওয়া সত্ত্বেও বেশ রাশভারী মেজাজে বললাম, বটেই তো। খাঁচার প্রাণীটার সঙ্গে বইয়ের কোনো একটা ছবি বা লেখার কোনো মিল পেলাম না।

-তাতে কী প্রমাণ হল?

আমাকে কফির কাপ তুলে দিতে-দিতে প্রশ্ন করল মারিয়ান। আমি বললাম, প্রমাণ এটাই হয় যে বনমানুষ, আদিমানব বা নরপিশাচ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কোনো বাস্তবতা নেই।

মারিয়ান বলল, আর চিড়িয়াখানার জীবটা সম্পর্কে কী মত আপনার?

-ওটাও হয়তো একটা ধড়িবাজি। যদিও একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে...

–কী খটকা?

–খটকা হল যে ঠিক অমন একটা জন্তুর কথা আমার ঠাকুরমা গল্প করে বলেছিলেন। পরে সেই বর্ণনার মতো একটা জন্তু আমি স্বপ্নেও দেখেছিলাম। আর তারপর এক সন্ধ্যেবেলা ঠিক সেই জীবটাকেই বসে থাকতে দেখেছিলাম আমাদের বাড়ির ছাদে। কিন্তু...

—কিন্তু সেটা যে সত্যিই দেখেছিলেন না স্বপ্নের ঘোরেই...

মারিয়ান হঠাৎ একটা সুদূর কণ্ঠস্বরে বলল, কিন্তু এখন যদি তাকে ফের সামনাসামনি দেখতে পান, তা হলে বিশ্বাস হবে? আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এখন দেখতে পাব মানে?

প্রশ্নটা শেষ হয়েছে কি হয়নি হঠাৎ দেখি মারিয়ানের তন্বী, সুন্দর দেহটা ক্রমশ রোমশ হয়ে উঠেছে। নীল, স্বপ্নিল চোখ দুটো ক্রমশ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। দাঁতগুলো হয়ে উঠছে ধারালো, আর দু-ধারের দুটো দাঁত বড়ো হয়ে হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে। আর বনমানুষের মতো সদ্য গজানো ধারালো নখ সামনে মেলে ধরে মেয়েটি (নাকি জন্তুটি?) একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি পরিষ্কার বাংলায় 'মাগো'! বলে চিৎকার করে হাতের গরম কফির কাপটা ওর কপাল টিপ করে ছুড়ে মেরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে লাগলাম।

কীভাবে যে রাস্তা চিনে হোটেলে ফিরলাম জানি না। ফিরে অন্ধকার ঘরেই সুটবুট পরেই বিছানায় সেঁধিয়ে ছেলেবেলার সেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখতে শুরু করলাম। তারপর মারিয়ানের ঘরের দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলে আমি নিশ্চয়ই জ্ঞান হারালাম। কারণ তারপর আর আমার কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান ফিরল সকালে হোটেলের চেম্বারমেডের বেল-এ। উঠে গিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে টের পেলাম আমার সারাগায়ে বেদম ব্যথা আর মাথা অসম্ভব

ভার। চেম্বারমেডকে ‘গুডমর্নিং!’ করে ওঁর হাতের খবরের কাগজটা নিলাম। আমার অবস্থা দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, কী হল আপনার? জ্বর? বললাম, জানি না। তবে শরীর বেশ খারাপ। প্যান্ট্রিকে বলে আমায় একটু কফি আনিয়ে দিন। ভদ্রমহিলা বললেন, তা দোব খন। তার আগে হোটেলের ডাক্তারটাকে একটা ফোন করে দিই। এই বলে চেম্বারমেড বেরিয়ে গেলেন।

আর আমি কাগজটা মেলে ধরলাম সামনে দিনের হেডিংগুলো ঝালিয়ে নেব বলে। কিন্তু প্রথম হেডিংটাতেই চোখ আটকে গেল—’মোরফিল্ডের রহস্যময় জন্তুর রহস্যময় অন্তর্ধান! আমি ব্যাপারটা লেজমুড়ো কিছুই না বুঝে আরও পড়তে লাগলাম। দেখলাম খবরে বলছে যে কাল বিকেল থেকে রহস্যময় জীবটাকে আর চিড়িয়াখানায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে সময়টার কথা উল্লেখ করেছে সে-সময়ে আমি মারিয়ানের ফ্ল্যাটে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছি।

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা আদিমানব ব্যাপারটাকেই ধাপ্পাবাজি বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। যে কর্নেল ফক্স জন্তুটিকে স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় থেকে ধরে এনেছিলেন তিনি সাংঘাতিক জেরার মুখে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। দেশ জুড়ে প্রবল হইচই আদিমানব কেচ্ছা নিয়ে। কেউ কেচ্ছা

ফাঁস করার সূত্র দিলে পুলিশ থেকে পুরস্কার দেবে বলে জানিয়েছে। আদিমানব স্ক্যাণ্ডালকে জাতীয় কেলেঙ্কারি আখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

অথচ বিকেল-বিকেল বাড়ি পালিয়ে এসে আমি এসবের কিছুই জানতে পারিনি। আমার মনে পড়ল মারিয়ানকে আর ওর ফ্ল্যাটের সেই ভয়ংকর ঘটনা। তবু রহস্যের শেষ দেখব বলে পকেট হাতড়ে ওর টেলিফোন নম্বর বার করে লবিতে গেলাম ফোন করতে। কিন্তু মারিয়ানের বদলে ফোন ধরল একজন পুরুষ। বলল সে পুলিশ। মারিয়ানের ঘরে তদন্ত তল্লাশি, আঙুলের

ছাপ নেওয়া চলছে। কাল বিকেলে একটা পাথরের কাপ ছুড়ে মেরে কেউ মেয়েটিকে হত্যা করে গেছে। আমার হাত থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা দড়াম করে পড়ে গেল নীচে।